নদী ও ভূমিক্ষয়
(River and Erosion)

ইউনিট ৬

ভূমিকা

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলধারাকে নদী বলে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্তবিভিন্ন পর্যায়ে নদী ক্ষয়, ক্ষয়িত পদার্থ বহন এবং সঞ্চয় কার্য করে থাকে। নদীর গতি ও কাজের ফলে গতিপথে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নদী ব্যবস্থাপনা বা নদীশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ইউনিটে আমরা নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উন্নয়ন, নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ ও বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা, নদীভাঙ্গন ও তার প্রভাব এবং নদীশাসন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৬.১ : নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন
পাঠ ৬.২ : নদীর ক্ষয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ
পাঠ ৬.৩ : নদীর বহনকার্য
পাঠ ৬.৪ : নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ ৬.৫ : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা
পাঠ ৬.৬ : বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন ও এর প্রভাব
পাঠ ৬.৭ : নদীশাসন

পাঠ-৬.১ নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন
(Origin, Growth and Development of River)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন

পানির ধর্ম নিচের দিকে গড়িয়ে চলা। পাহাড়, পর্বত বা কোনো উঁচুভূমি হতে বৃষ্টির পানি, প্রস্রবণ, হিমবাহ, তুষারগলা পানি এবং হ্রদের পানি ছোট ছোট ধারায় নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এ ছোট ছোট প্রাকৃতিক জলধারা একত্রে মিলিত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদে অথবা সমুদ্রে পতিত হয় তখন তাকে নদী বলে। অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নির্দিষ্ট খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলধারাকে নদী বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠনে যেসব প্রাকৃতিক শক্তি সরাসরি অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে নদী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, সুরমা, কুশিয়ারা, করতোয়া, মহানন্দা, মধুমতি ইত্যাদি। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ। এর দৈর্ঘ্য ৬,৬৬৯ কি.মি.। এটি আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

নদীর উৎপত্তি (Origin of Rivers)

পৃথিবীর অধিকাংশ নদীই পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বৃষ্টির পানি, বরফ গলা পানি, হিমবাহের পানি, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমভূমিতে প্রবাহিত হয়ে সাগর বা মহাসাগর বা হ্রদে মিলিত হয়। নদীর আকার, আকৃতি এবং নদীর কার্যাবলী নির্ভর করে উৎসস্থলের পানি সরবরাহের পরিমাণের ওপর। উৎসস্থলের পানি সরবরাহ বেশি হলে নদীর আকার, নদীর চলার গতিবেগ সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদীর নাম ও উৎপত্তিস্থল উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান নদীর উৎপত্তি স্থল		বিশ্বের কয়েকটি প্রধান নদীর উৎপত্তি স্থল	
নদী	**উৎপত্তি স্থল**	**নদী**	**উৎপত্তি স্থল**
পদ্মা	গঙ্গা নামে হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ	হোয়াংহো	কুনকুন পর্বত, চিন দেশ
মেঘনা	আসামের লুসাই পাহাড়	মিসিসিপি	মিনোসোটার হ্রদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যমুনা	ব্রহ্মপুত্র নামে কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ	দানিয়ুব	ব্ল্যাক ফরেস্ট, ইউরোপ
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড়	মারে ডার্লিং	কোমিয়াস্কে, অষ্ট্রেলিয়া
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল	তিস্তা	সিকিমের পর্বত অঞ্চল
সাঙ্গু	মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড়	নীলনদ	ভিক্টোরিয়া হ্রদ, আফ্রিকা মহাদেশ
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদানাতলী পর্বতশৃঙ্গ।	আমাজান	আন্দিজ পর্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকা
মহানন্দা	মহালড্রীম, দার্জিলিং		

নদীর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বা পর্যায় (Stage of River)

উৎপত্তি স্থল হতে মোহনা পর্যন্তনদীর আয়তন, গভীরতা, স্রোত ও নগ্নীভবন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি আদর্শ নদীর গতিকে চারটি পর্যায়ে বা অবস্থায় (Stage) ভাগ করা যায়। যেমন- ১. প্রাথমিক অবস্থা, ২.যৌবন অবস্থা, ৩.প্রবীণ অবস্থা এবং ৪. বার্ধক্য অবস্থা (চিত্র ৬.১.১)।

১। প্রাথমিক অবস্থা (Initial Stage) : পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টি ও বরফ গলা পানি সরবরাহ খুব বেশি। পার্বত্য অঞ্চল থেকে ছোট ছোট স্রোতধারাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে একটি প্রবল স্রোতধারার সৃষ্টি করে। ভূমির ঢাল খাড়া হওয়ায় প্রবল

স্রোতধারাটি ক্ষয়সাধন করতে করতে অগ্রসর হয়। এ সময় নদী উপত্যকা গভীর হয়। প্রবল স্রোতের বেগ বড় বড় পাথর, নুড়ি প্রভৃতি স্রোতের সাথে বহন করে। এটি নদী সৃষ্টির প্রথম অবস্থা বলে একে প্রাথমিক অবস্থা বলে। এ সময় নদীর উদ্যম বেশি থাকে বলে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকার ক্ষয় সাধিত হয়।

২। যৌবন অবস্থা (Youth Stage) : এ সময় নদী পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাধারণত পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত নদীর স্রোতের বেগ প্রবল থাকে। এই অবস্থায় ক্ষয় ও বহন উভয় প্রক্রিয়া কার্যকর থাকলেও ক্ষয় কার্যের প্রাধান্য থাকে এবং নদী খাত 'V' অক্ষরের ন্যায় হয়। নদীখাতের কোথাও বর্তুলাকার গর্ত দেখা যায়। নদী প্রবাহের মধ্যবর্তী এই অবস্থাকে যৌবন অবস্থা বলে।

৩। প্রবীণ অবস্থা (Mature Stage) : নদীর তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে প্রবীণ অবস্থা। এ সময় নদীর স্রোতের বেগ হ্রাস পাওয়ায় ক্ষয়সাধন ও পরিবহন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। নদীবাহিত পলি নদীর তলদেশে সঞ্চিত হয়ে তলদেশের গভীরতাও কমে যায়। ক্ষয়কার্য সামান্য হয় বলে নদীর পার্শ্বীয় ক্ষয় অর্ধেক হয় এবং নদী খাত ইংরেজি ইউ অক্ষরের ন্যায় খাত সৃষ্টি করে। তখন নদী সমভূমির উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে (Meanderning flow) প্রবাহিত হয়। কোথাও কোথাও অশ্বখুরাকৃতির হ্রদের সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি নদীর জীবনকালের এটি তৃতীয় পর্যায় বলে একে প্রবীণ অবস্থা বলে।

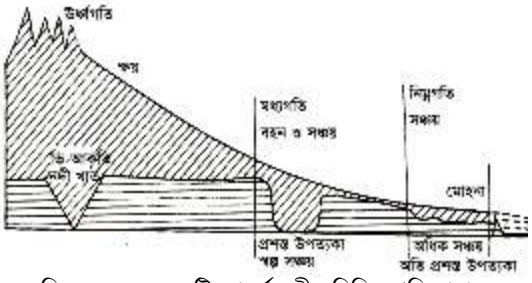

চিত্র ৬.১.১ : একটি আদর্শ নদীর বিভিন্ন গতি প্রবাহ

৪। বার্ধক্য অবস্থা (Old Stage) : নদীর বার্ধক্য অবস্থায় নদী উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয় এবং গভীরতা একেবারে কমে যায়। স্রোতের বেগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। বর্ষা ঋতুতে নদীর দুইকূল উপচিয়ে পানি সমভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে নদীবাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) সৃষ্টি করে। নদী মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে ব-দ্বীপ (Delta) গঠিত হয়। মূলত এ অবস্থায় নদী সাগরের সাথে মিশে মোহনার সৃষ্টি করে।

নদী সম্পর্কিত বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ ও সংজ্ঞা।

নদীর উৎস (Source) : নদীর উৎপত্তিস্থলকে নদীর উৎস বলে।

নদীর মোহনা (Mouth) : নদী উৎপত্তি লাভ করে সাগর বা হ্রদের সাথে যে স্থানে মিলিত হয় সেই মিলিত স্থানকে নদীর মোহনা বলে।

দোয়াব অঞ্চল : দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে দোয়াব অঞ্চল বলে।

উপনদী (Tributary): বিভিন্ন উৎস হতে যখন ছোট ছোট নদী উৎপত্তি লাভ করে কোনো বড় নদীতে মিলিত হয় তখন এ ছোট নদীগুলোকে সে বড় নদীর উপনদী বলে। যেমন- যমুনার উপনদী করতোয়া, তিস্তা এবং মেঘনার উপনদী সুরমা ও কুশিয়ারা।

শাখানদী (Distributory) : কখনো কখনো বড় কোনো নদী হতে স্রোতধারা বের হয়ে অন্য কোনো নদী, সাগর, হ্রদ বা পুনরায় মূল নদীর সাথে মিলিত হয়। এরূপ মূল নদী হতে যে সকল নদী বের হয় তাকে শাখানদী বলে। যেমন- ইছামতি, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি পদ্মার শাখানদী।

নদীসঙ্গম (Confluence) : পার্বত্য অঞ্চলে প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলো নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হয়। এক সময় ঐ নদীগুলো একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়। ফলে মিলিত স্রোতধারা ক্রমশ অধিকতর বড় হয়। এভাবে দুই বা ততোধিক নদীর মিলন স্থলকে নদীসঙ্গম বলে।

নদী অববাহিকা (River Basin) : মূল নদী, বিভিন্ন শাখানদী ও উপনদী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে সকল স্থানের বা অঞ্চলের পানিরাশি প্রবাহিত হয় তখন এ অঞ্চলকে ঐ নদীর অববাহিকা বলে। যেমন- পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধু নদের অববাহিকা।

নদী উপত্যকা (River Valley): নদীর উৎস হতে মোহনা পর্যন্তগতিপথে যে স্থানের মধ্য দিয়ে পানিরাশি প্রবাহিত হয় সেই খাতকে উক্ত নদীর উপত্যকা বলে।

নদীগর্ভ বা নদীতট : নদী উপত্যকার তলদেশকে বলা হয় নদীগর্ভ ।

জলবিভাজিকা : যে উচ্চভূমি বিভিন্ন নদীজ এলাকাকে আলাদা করে থাকে তাকে জলবিভাজিকা বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ ও বিশ্বের কয়েকটি নদী ও তার উৎপত্তি স্থলের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ছোট ছোট প্রাকৃতিক জলধারা একত্রে মিলিত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদে অথবা সমুদ্রে পতিত হয় তখন তাকে নদী বলে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, সুরমা কুশিয়ারা, করতোয়া, মহানন্দা, মধুমতি প্রভৃতি। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ। উৎপত্তি স্থল হতে মোহনা পর্যন্তনদীর আয়তন, গভীরতা, স্রোত ও নগ্নীভবন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি আদর্শ নদীর গতিকে চারটি পর্যায়ে বা অবস্থায় ভাগ করা যায়। যথা- ১. প্রাথমিক অবস্থা ২.যৌবন অবস্থা ৩.প্রবীণ অবস্থা এবং ৪. বার্ধক্য অবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদী উপত্যকার তলদেশকে কী বলা হয়?
(ক) নদীগর্ভ (খ) উপনদী (গ) মোহনা (ঘ) শাখানদী

২। নদী উৎপত্তি লাভ করে সাগর বা হ্রদের সাথে যে স্থানে মিলিত হয় সেই মিলিত স্থানকে কী বলে?
(ক) নদীগর্ভ (খ) উপনদী (গ) মোহনা (ঘ) শাখানদী

৩। একটি আদর্শ নদীর গতিকে কতটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?
(ক) ৪ (খ) ৫ (গ) ৩ (ঘ) ৬

৪। নদীর যৌবন অবস্থা কোথায় দেখা যায়?
(ক) মরু অঞ্চলে (খ) সমভূমিতে (গ) পার্বত্য অঞ্চলে (ঘ) মালভূমিতে

৫। তিব্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে উৎপত্তি হয়েছে কোন নদীর?
(ক) গঙ্গা (খ) ব্রহ্মপুত্র (গ) পদ্মা (ঘ) মেঘনা

পাঠ-৬.২ নদীর ক্ষয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ
(Erosion and Erosional Featuers of River)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর কার্য সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- নদীর ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহের নাম বলতে পারবেন।

নদীর কার্য

নদী পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করার পর মালভূমি, সমভূমি, প্লাবনভূমি, ব-দ্বীপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিতকালে যে কার্য সমাধা করে সে কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ক্ষয়কার্য ২. পরিবহন এবং ৩. সঞ্চয়কার্য।

নদীর ক্ষয়কার্য (Erosion of the River)

নদী তার ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে নানা ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে। নদীর এ ক্ষয়কার্য রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ে সংঘটিত হয়। ক্ষয়কার্য সাধারণত চারটি প্রক্রিয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। যথা- ১. পানি প্রবাহ ক্ষয়, ২. কর্ষণ, ৩.ঘর্ষণ এবং ৪. দ্রবণ।

১। পানি প্রবাহ ক্ষয় (Hydraulic Action) : পানি প্রবাহের মাধ্যমে নদীর ক্ষয়ক্রিয়া সংঘটিত হয়। নদীতে প্রবল স্রোতের ফলে নদীগর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে ক্ষয়সাধিত হয়ে থাকে। পানি প্রবাহের ফলে এ ক্ষয়কার্য হয় বলে একে পানিপ্রবাহ ক্ষয় বলে।

২। কর্ষণ (Corrosion) : নদীবাহিত নুড়ি, পাথর প্রভৃতির ঘর্ষণের ফলে নদী খাতে ক্ষয় হয়। নদীবাহিত নুড়ি বা পাথর খন্ডগুলো নদীর স্রোতের সাথে ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয় এবং নদীখাতের ভিতর ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি করে। ফলে নদীখাত দ্রুত ক্ষয় হয়। এ জাতীয় ক্ষয়কার্যকে কর্ষণ বলা হয়।

৩। ঘর্ষণ (Attrition) : নদীর স্রোতের সাথে যে সমস্ত নুড়ি, পাথর, শিলারাশি বাহিত হয় সেগুলো পরস্পরের সাথে আঘাতে খন্ড-বিখন্ড ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বালুকা ও কর্দমে পরিণত হয়। ফলে নদীর স্রোত খুব সহজে এগুলো বহন করতে পারে। এরূপ ক্রিয়াকে ঘর্ষণ ক্ষয় বলে।

৪। দ্রবণ (Solution) : ভূ-ত্বকের রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ নদীর পানির সাথে দ্রবীভূত হয়ে নদীর প্রস্তর খন্ডগুলোকে দ্রবীভূত করে। ফলে প্রস্তর খন্ডসমূহ সহজে ক্ষয় হয়। এ জাতীয় ক্ষয় চুনাপাথর অঞ্চলে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (Erosional Features of River)

নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নতুন নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয়কার্য অত্যন্তবেশি হয়। নিচে ক্ষয়জাত ভূমিরূপের বিবরণ দেওয়া হলো-

১। 'ভি' আকৃতি উপত্যকা ('V' shaped Valley) : পার্বত্য অঞ্চলের শিলা তুলনামূলকভাবে কঠিন থাকে। সেখানে নদীর স্রোতের গতিবেগ বেশি থাকায় নদী পার্শ্বক্ষয়ের তুলনায় তলদেশের ক্ষয়সাধন অধিক হয়। এ সময় পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকার মধ্যভাগ অধিক ক্ষয় হতে হতে কালক্রমে ইংরেজি 'V' অক্ষরের ন্যায় রূপধারণ করে। এজন্য এ ধরনের উপত্যকাকে 'V' আকৃতির উপত্যকা বলে (চিত্র ৬.২.১)। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পার্শ্বদিকে ক্ষয়ের পরিমাণ বেশি হলে উপত্যকা ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত হতে থাকে।

চিত্র ৬.২.১ : ভি আকৃতির উপত্যকা

২। জলপ্রপাত (Waterfall) : যখন কোনো নদী একটি কঠিন শিলাস্তর অতিক্রম করে অন্য একটি কোমল শিলাস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন শিলাস্তরটি কঠিন শিলাস্তরের তুলনায় দ্রুত ক্ষয় হয়। এভাবে কোমল শিলাস্তরটি দ্রুত ক্ষয় হয়ে কঠিন শিলাস্তরের চেয়ে অনেক নিচুতে নেমে যায়। নদীর এরূপ

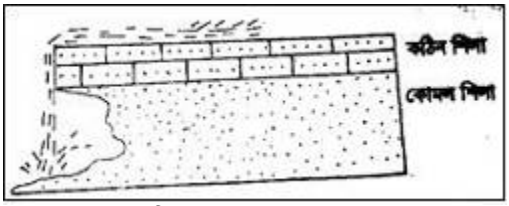

চিত্র ৬.২.২ : জলপ্রপাত

উচ্চস্থান হতে উল্লম্বভাবে সরাসরি নিচে পতিত হলে তাকে জলপ্রপাত বলে (চিত্র ৬.২.২)। আবার চ্যুতির ফলে কোনো কোনো নদী উপত্যকার কোনো স্থান নিচে বসে গেলে অথবা উপরে উত্থিত হলে সেখানেও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর জলপ্রপাত, আফ্রিকার জাম্বেসী নদীর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত প্রভৃতি। আবার কোথাও মালভূমির প্রান্তভাগ খাড়াভাবে নিচে নেমে সমভূমিতে মিলিত হয়ে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। যেমন-বিহারের রাচি জেলার হুনড্রু (Hundru) জলপ্রপাত এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলের জলপ্রপাত।

৩। গিরিসংকট (Ravine) : অত্যন্তগভীর ও খাড়া পাড়বিশিষ্ট নদী উপত্যকাকে গিরিসংকট বলে। যদি নদীর উভয়পার্শ্ব অপেক্ষা নদীর তলদেশ ক্ষয় অধিক হারে হয় তাহলে নদীখাত ক্রমশ গভীর হয়ে দীর্ঘদিন পর গিরিসংকটের সৃষ্টি হয়। যেমন- কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধু নদের গিরিসংকটটি প্রায় ১৭০০ ফুট গভীর। তাছাড়াও ব্রহ্মপুত্র, কাবুল, ইয়াংসিকিয়াং, রাইন, দানিয়ুব প্রভৃতি নদীর গিরিসংকটগুলো বিখ্যাত।

৪। গিরিখাত (Gorge) : গিরিখাত দেখতে অনেকটা গিরিসংকটের মতো। গিরিখাত সাধারণত গিরিসংকটের চেয়ে সুদীর্ঘ এবং অধিক গভীরতাবিশিষ্ট। গিরিখাতগুলো এত দীর্ঘ এবং গভীর হয় যে দেখলে মনে হবে সুদীর্ঘ পার্বত্য সুড়ঙ্গ (চিত্র ৬.২.৩)। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো নদীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (Grand Canyon) পৃথিবীর গভীরতম এবং দীর্ঘতম গিরিখাত। এটি প্রায় ১.৫ মাইল গভীর এবং তিনশত মাইল দীর্ঘ।

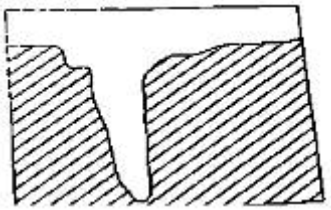
চিত্র ৬.২.৩ : গিরিখাত

৫। নদীপ্রপাত (Rapid) : প্রবাহমান নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর থাকলে কঠিন শিলাস্তর অপেক্ষা কোমল শিলাস্তড়র অধিক ক্ষয় হয়। কোমল শিলাস্তর অধিক ক্ষয় হওয়ার কারণে কখনো কখনো সেখানকার ভূ-প্রকৃতি সিঁড়ির ন্যায় রূপলাভ করে। তখন নদীর পানিপ্রবাহ সিঁড়ির মতো ভূমির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচের দিকে প্রবলবেগে চলতে থাকে। এরূপ অবস্থাকে নদীপ্রপাত বলে (চিত্র ৬.২.৪)। অত্যন্তপ্রবলবেগে প্রবাহিত হয় বলে একে আবার খরস্রোতও বলে।

৬। নদীর বাঁক (Meanders) : নদী যখন সমভূমি অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন নদীর স্রোত ও ক্ষয়কার্য কমে যায়। সে সময় নদীর গতিপথে কঠিন শিলা থাকলে নদী বেঁকে প্রবাহিত হয়। এ ধরনের নদীর বাঁকা অঞ্চলকে নদীর বাঁক বলে (চিত্র ৬.২.৫)।

৭। বর্তুলাকার গর্ত (Pot Holes) : দ্রুতবেগে নদী স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় নদী উপত্যকার কোনো কোনো স্থানে ঘূর্ণিস্রোতের সৃষ্টি হয়। তখন নদীর তলদেশের কোনো কোনো স্থানে কোমল শিলাস্তর দ্রুত ক্ষয় হয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় গর্তকে বর্তুলাকার গর্ত বলে (চিত্র ৬.২.৬)। পদ্মা এবং যমুনা নদীগর্ভে এ ধরনের গর্ত দেখা যায়।

চিত্র ৬.২.৪ : নদী প্রপাত

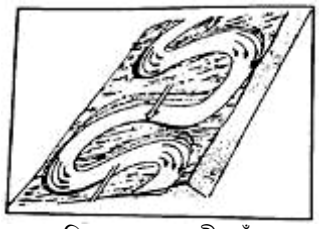
চিত্র ৬.২.৫ : নদীর বাঁক

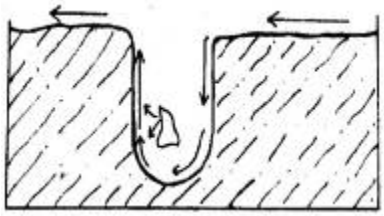
চিত্র ৬.২.৬ : বর্তুলাকার গর্ত

শিক্ষার্থীর কাজ	নদীর ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়াগুলি কী কী? বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নদী পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করার পর মালভূমি, সমভূমি, প্লাবনভূমি, ব-দ্বীপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে কার্য সমাধা করে সে কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) ক্ষয়কার্য (২) পরিবহন (৩) সঞ্চয়কার্য। নদীর ক্ষয়কার্য

রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ে সংঘটিত হয়। ক্ষয়কার্য সাধারণত চারটি প্রক্রিয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। যথা- ১. পানি প্রবাহ, ২. কর্ষণ, ৩.ঘর্ষণ ক্ষয় এবং ৪. দ্রবণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীর ক্ষয়কার্য সাধারণত কতটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে?

(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ২ (ঘ) ৫

২। নদীর উচ্চস্থান হতে উল্লম্বভাবে সরাসরি নিচে পতিত হলে তাকে কী বলে?

(ক) উপনদী (খ) জলপ্রপাত
(গ) মোহনা (ঘ) উৎস

৩। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর আকৃতি কেমন থাকে?

(ক) ভি আকৃতি (খ) ইউ আকৃতি
(গ) এ আকৃতি (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
নদী উৎপত্তি থেকে সাগরে বা জলাধারে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্তবিভিন্ন পর্যায়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে। নদীর এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নদীর দুই ধারে ও নদীতলদেশে ক্ষয়সাধন করে থাকে।

৪। নদীর বাঁক তৈরি হয় কোথায়?

(ক) সমভূমিতে (খ) মোহনায়
(গ) নদীর উৎসে (ঘ) মালভূমিতে

৫। দ্রবণ কোন অঞ্চলে বেশি দেখা যায়?

(ক) পাহাড়ি অঞ্চলে (খ) সমতলে
(গ) চুনাপাথর অঞ্চলে (ঘ) মোহনায়

পাঠ-৬.৩ নদীর বহনকার্য (River Transportation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর বহনকার্য ব্যাখ্যা ও বিশে- ষণ করতে পারবেন।

নদীর বহনকার্য

নদীর মোট শক্তির শতকরা ৯৫ থেকে ৯৭ ভাগই ঘূর্ণী ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়। বাকী অংশ শুধু পরিবহন কাজে ব্যয় হয়। যে কোনো বৃহৎ নদী প্রস্তরখন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি তার বোঝা রূপে বহন করে থাকে। নদী তার এই বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যথা- ১. দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন, ২. ভাসমান অবস্থায় বহন, ৩. লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন এবং ৪. আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

১. দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন (Solution) : নদী তার গতিপথে অনেক সময় কোনো কোনো প্রস্তরখন্ডকে পানির সাথে দ্রবীভূত করে তা পানি স্রোতের সঙ্গে বহন করে। চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে নদী এ দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভার বহন করে। নদীর দ্রবীভূত বোঝার **(Dissolved load)** পরিমাণে খুব তারতম্য হয়। নদীতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। পৃথিবীর প্রধান নদীসমূহের গড় দ্রবীভূত বোঝার পরিমাণ ১১৫ থেকে ১২০ পি.পি.এস.। প্রতি বছর এ সমস্ত নদী থেকে প্রায় ৪ বিলিয়ন (৪০০ কোটি) মেট্রিক টন দ্রবীভূত পদার্থ সমুদ্রে পতিত হয়।

২. ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension) : নদীর ঘোলা পানি থেকে সহজেই ভাসমান বোঝার ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভাসমান বোঝার প্রধান অংশ মূলত বালি, পলি ও কর্দম আকৃতির পদার্থে গঠিত। অনেক সময় ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখন্ড নদীর স্রোতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে যায়, একে ভাসমান বোঝা বলে।

৩. লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন (Saltation) : তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার স্রোতের বেগে নদীর তলদেশের ক্রিয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। একে লম্ফ প্রক্রিয়া বহন বলে।

৪. আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন (Traction) : নদীজ লোড বা বোঝার বড় আকৃতির পদার্থ যেমন- বোল্ডার থাকতে পারে যা ভাসমান অবস্থায় রাখা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ভারী ও বড় পদার্থসমূহ হচ্ছে নদীর তলদেশীয় ভার (Bed Load)। নদীবাহিত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ নদীর তলদেশ দিয়ে স্রোতের টানে বাহিত হয় বলে একে নদীগর্ভ বোঝা (Bed load) বা টান বা আকর্ষণ ভার বলা **(Traction Load)** হয়। এই টান বা আকর্ষণের দ্বারাও নদী বহন করে থাকে। ধারণা করা হয়, নদীর তলদেশীয় ভার মোট ভারের শতকরা ১০ ভাগের বেশি হয় না।

নদীর বহন করার ক্ষমতার কারণঃ নিম্নলিখিত কারণে নদীর বহন করার ক্ষমতা পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- (ক) নদীতে পানি কমে গেলে,(খ) নদী-ঢালেরপরিবর্তন হলে, (গ) নদীর শক্তির তুলনায় অধিক পরিমাণ প্রস্তরখন্ড (Load) নদীতে আসলে এবং (ঘ) নদী কোনো হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে। এরূপ অবস্থায় নদীর তলদেশে কিছু কিছু প্রস্তরখন্ড জমা হতে থাকে। বৃহদাকার প্রস্তরগুলো নদীর উচ্চ প্রবাহে এবং ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি নদীর নিম্নপ্রবাহে অর্থাৎ মোহনার নিকট জমা হয়। একে নদীর অবক্ষেপন (Deposition) বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নদীর ক্ষয়কার্যের নিয়ামকসমূহ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

যে কোনো বৃহৎ নদী প্রস্তরখন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি তার বোঝা রূপে বহন করে থাকে। নদী তার এই বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যথা- (১) দ্রবণ প্রক্রিয়ায়, (২) ভাসমান অবস্থায় বহন, (৩) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় বহন ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীর মোট শক্তির কত ভাগ বহন কার্যে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) ৯৫% (খ) ৫০% (গ) ৫% (ঘ) ২৫%

২। নদীর বড় বোঝা বা বোল্ডার কোন প্রক্রিয়ায় বহন করে থাকে?

(ক) দ্রবণ প্রক্রিয়ায় (খ) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন

(গ) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় বহন (ঘ) ভাসমান অবস্থায় বহন

৩। নদী কয়টি প্রক্রিয়ায় বোঝা বহন করে থাকে?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৪। দ্রবণ প্রক্রিয়ায় বহন হয় কোনটি?

(ক) পলি ও কর্দম (খ) কর্দম (গ) বালু (ঘ) নুড়ি

পাঠ-৬.৪ নদীর সঞ্চয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ
(Deposition & Depositional Featuers of River)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহের নাম বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ উদ্ভবের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নদীর সঞ্চয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ

সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে নদীর নিম্নগতি থাকে। এ সময় নদী উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয় এবং গভীরতা একেবারে কমে যায়। ফলে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদীস্রোতের সাথে বাহিত হয়ে অত্যন্তবিস্তৃত প্লাবন ভূমি গড়ে উঠে। নদী বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে তার গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এ অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন ভূমি, নদী বাঁক, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী, ব-দ্বীপ অন্যতম। নিম্নে নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপসমূহের বিবরণ দেয়া হলো-

১. পলল পাখা ও পলল কোণ (Alluvial Fan and Alluvial Cone): পাহাড়, পর্বত বা উচ্চ অঞ্চল থেকে নদী সমতল ভূমিতে নেমে আসার ফলে ঢাল দ্রুত কমে যায়। এ অবস্থায় নদীর পানিতে বাহিত বিভিন্ন ধরনের পদার্থের বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে তা পাদদেশের নদী খাতেই সঞ্চয় করে। এক পর্যায়ে নদী তার এ বোঝা এড়িয়ে নতুন পথে নিম্ন অঞ্চলে অগ্রসর হয়। এভাবেই নদী পাহাড়ের পাদদেশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে স্থান পরিবর্তন করে এবং অবশেষে তা পাখার ন্যায় ঢালু ভূমিরূপ সৃষ্টি করে যা পলল পাখা নামে পরিচিত (চিত্র ৬.৪.১)। পলল পাখা শুষ্ক এলাকায় গঠিত হয় এবং উর্ধ্বমুখী ভাগের সম্প্রসারণ পানি তল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পলল পাখার পলি মোটা, বড় বড় শিলা টুকরো এবং বালি ও নুড়ি পাথরই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর যে সকল অঞ্চলে মাটি অধিক পরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে, সে সকল অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে পলল কোণ (Alluvial Cone) বলে (চিত্র ৬.৪.২)।

চিত্র ৬.৪.১ : পলল পাখা

চিত্র ৬.৪.২ : পলল কোণ

২. পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Peidmont Alluvial Plain): পাহাড়ের পাদদেশে নদীবাহিত পানি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গড়ে ওঠে তাকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলে। বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই পাদদেশীয় পলল সমভূমি নামে পরিচিত। তিস্তা, আত্রাই, যমুনেশ্বরী প্রভৃতি নদী দ্বারা এ অঞ্চল বিধৌত। এসব নদী হিমালায় পর্বত হতে উৎপন্ন হয়েছে। ফলে নদীগুলো সহজেই পাহাড় হতে পলল বহন করে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পললভূমি গঠন করেছে। পাহাড়ের পাদদেশে দুই বা ততোধিক পলল পাখা বা কোণ মিলিত হয়েও পাদদেশীয় পলল সমভূমি গঠন করতে পারে।

৩. প্লাবন সমভূমি (Flood Plain): অধিকাংশ নদী তার নিম্ন প্রবাহে সূক্ষ্ম কর্দম, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত করে থাকে। বন্যা বা প্লাবনে নদী দু'কূল ভাসিয়ে পানিতে ডুবে যায় এবং তাতে নতুন পলি সঞ্চিত হয়। এরূপ নদীর নিম্নাংশে বা মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবন সমভূমির (Flood Plain) সৃষ্টি করে (চিত্র ৬.৪.৩)। গঙ্গা, পদ্মা, নীল, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীর মোহনায় এরূপ প্লাবন সমভূমি রয়েছে। প্লাবন সমভূমিতে স্বাভাবিক বাঁধ, পশ্চাৎ জলাভূমি, নদীর বাঁক, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, বালুচর প্রভৃতি ভূমিরূপ দেখা যায়।

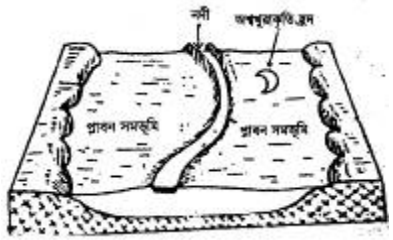

চিত্র ৬.৪.৩ : প্লাবন সমভূমি

৪. প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural Levee): প্লাবন ভূমিতে নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রাকৃতিক বাঁধ লক্ষ্য করা যায়। নদীর নিকটবর্তী এলাকায় এর উচ্চতা সবচেয়ে বেশি হয় এবং পিছনের দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যায়। প্লাবনের সময় নদীর পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি এই বাঁধের উৎপত্তির প্রধান কারণ। প্লাবনের সময় নদীর দু'কূল ছাপিয়ে যখন পানি পার্শ্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন উর্ধ্ব ঢালের দিকে পানি প্রবাহ থাকে বলে পানি মধ্যস্থিত পলি নদীর

তীরবর্তী এলাকায় সবচেয়ে বেশি জমা হয় এবং যতদূরে যাওয়া যায় ততই পলি কম সঞ্চিত হয়। প্লাবনের ফলে এরূপ সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে বাঁধের আকার ধারণ করে, এরূপ বাঁধকে প্রাকৃতিক বাঁধ বলে।

নদী গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী নদী প্রাকৃতিক বাঁধ প্লাবন সমভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ক্ষয়ের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। প্লাবন অধিক হলে নদী স্বাভাবিকভাবে কতগুলো অগভীর খাত বরাবর প্রবাহিত হয়। এগুলোকে প্লাবন ভূমি কর্তিত পথ (Flood Plain Scour Route) বলে। এগুলো পুরাতন নদীখাতকে বা নদীখাত সৃষ্টির সূচনাকে উপস্থাপিত করে।

৫. পশ্চাৎ জলাভূমি সঞ্চয় (Back Swamp): প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাৎ দিকে নদীর পলি সঞ্চয় ক্রমশ কম হওয়ায় তা নিম্নভূমিরূপে অবস্থান করে। বর্ষার পরে বন্যার পানি সরে গেলে এ নিম্নভূমিতে জল আবদ্ধ অবস্থায় থেকে যায়। প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে অবস্থিত এরূপ জলাভূমিকে পশ্চাৎ জলাভূমি (Back Swamp) বলা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে জলাভূমি রয়েছে। এগুলো অনেক সময় 'বিল' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নদী প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে এই জলাভূমি সৃষ্টি করে। পলি ও কাঁদা দিয়ে এই সুবিস্তৃত ভূমি গঠিত হয়। পশ্চাৎ জলাভূমি এলাকার বন্ধুরতা দুই মিটারেরও কম থাকে।

৬.পশ্চাৎ ঢাল (Back Slope): স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত মৃদু ঢাল বিশিষ্ট ভূমিকে পশ্চাৎ ঢাল বলা হয়। এ পশ্চাৎ ঢাল জলাভূমি পর্যন্তবিস্তৃত থাকতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর পশ্চাতে এরূপ পশ্চাৎ ঢাল রয়েছে।

৭. জলাভূমি (Marshes or Beel): নদী গতি পরিবর্তন করলে প্লাবন ভূমির মধ্যস্থ পরিত্যক্ত গতিপথ ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে উঠে। কিন্তু যে সব স্থান ভরাট হয় না সেখানে পানি জমে জলাভূমির সৃষ্টি করে। আবার প্লাবন ভূমির অভ্যন্তরের নিচু অঞ্চলে পানি জমেও জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এরূপ জলাভূমিকে বিল (Bill) বলা হয়। যেমন- রাজশাহী চলনবিল, গোপালগঞ্জ জেলার বিল ও সিলেটের বিল এ জাতীয় জলাভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৮. নদী বাঁক (Meander): নদী বাঁক একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীজ বৈশিষ্ট্য যা প্রায়ই চোখে পড়ে। নদী বাঁকের ক্ষয় ক্রিয়ার কারণে নদী খাতের অবস্থানে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়, কিন্তু খাতের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। নদীর গতিপথে উঁচু-নিচু স্থান বা কঠিন শিলা থাকলে নদীর গতি বেঁকে যায়। একে সর্পিল বা আঁকাবাঁকা নদী (Meandering River) বলে। বাঁকের মুখে নদী তীরের যে স্থানটি স্রোতের ঠিক সম্মুখে থাকে, স্রোতের আঘাতে সেখানে খুব বেশি ক্ষয় হয়। ফলে ঐ স্থানে নদী প্রতি বছর ভাঙ্গতে থাকে এবং তার বিপরীত দিকে স্রোতের বেগ হ্রাস পাওয়ায় সেখানে পলি মাটি ও বালুকা সঞ্চিত হয়ে চর পড়তে থাকে। বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমিতে এরূপ ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। নদী আঁকাবাঁকা হয়ে উত্তল ও অবতল পাড়ের সৃষ্টি করে। উত্তল পাড়ে সঞ্চয় এবং অবতল পাড়ে ক্ষয়সাধন করে। উত্তল পাড়ের পলি সঞ্চয় করে যে সংলগ্ন চরের সৃষ্টি করে তাকে বিন্দু বার (Point Bar) বলে (চিত্র ৬.৪.৪)।

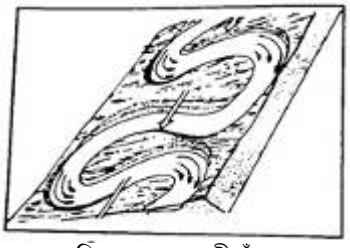
চিত্র ৬.৪.৪ : নদী বাঁক

৯. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Ox Bow Lake): সমভূমিতে প্রবাহিত কোনো কোনো নদীতে অসংখ্য বাঁক দেখা যায়। কোনো কোনো সময় এ বাঁক এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, দুটি বাঁক নিজেদের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। এক পর্যায় উভয় অংশ মিলে যায় এবং নদী সোজাভাবে চলতে থাকে। আর ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁকা অংশটি নদীখাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে। এরূপ হ্রদগুলো দেখতে অনেকটা অশ্বের ক্ষুরের ন্যায় বলে এদের অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলা হয় (চিত্র ৬.৪.৫)। বাংলাদেশের পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতে বহু অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ দেখা যায়। এসব হ্রদে পলিমাটি সঞ্চিত হলে সেগুলো ভরাট হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ সমভূমিকে কর্দম ছিপি বলে। এরূপ ভূমিরূপ বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়।

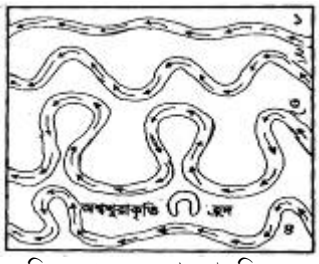

চিত্র ৬.৪.৫ : অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ

১০. বালুচর ও বিনুনী নদী (Sand Bar and Braided River): কোনো নদীর পরিবহন ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত পলি উৎস অঞ্চল থেকে নদীতে সরবরাহ হলে তা নদী খাতেই জমা হয়। নদীর ভিতর বালি, নুড়ি, কাঁকর, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে বালুচর বলে (চিত্র ৬.৪.৬)। বালুচর প্রধানত দুটি কারণে সৃষ্টি হয়। প্রথমত, নদীর পানিতে যখন অতিরিক্ত বালু, কর্দম, নুড়ি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে তখন স্রোতের বেগ কমে যায় এবং বাহিত পদার্থসমূহ দ্রুত সঞ্চিত হয়ে বালুচরের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত নদীখাতে অতিরিক্ত

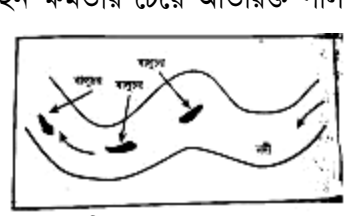

চিত্র ৬.৪.৬ : বালুচর

পলি সঞ্চয়নের কারণে বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এরূপ বহু শাখা বিশিষ্ট পানির ধারা অনেকটা চুলের বিনুনীর মতো দেখতে। একে বিনুনী নদী বা চর উৎপাদী নদীও বলা হয়। যে সকল নদীতে পানির প্রবাহে ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন ব্যাপক হয় সেখানে এ ধরনের নদী বিন্যাস দেখা যায়। বাংলাদেশের যমুনা নদীতে এ ধরনের বিনুনী বিন্যাস দেখা যায়। এজন্য যমুনা নদীকে চর উৎপাদী নদী বলা হয়।

১১. ব-দ্বীপ (Delta): নদীর নিম্ন গতিতে স্রোতের বেগ খুব কমে যায় এবং নদীর পানির সঙ্গে মিশ্রিত শিলাচূর্ণ, বালি, কাঁদা প্রভৃতি তলানিরূপে সঞ্চিত হতে থাকে। নদীর মোহনায় সমুদ্রের লবণ মিশ্রিত পানি এ তলানি পড়তে বিশেষভাবে সাহায্য করে। নদী যদি কোনো কম স্রোত বিশিষ্ট বা স্রোতহীন সমুদ্রে পড়ে, তাহলে ঐ সমস্ত নদীর মুখে জমতে জমতে নদী মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে ঐ চরাভূমি সমুদ্রের পানির ওপর উঁচু হয়ে ওঠে। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় ঐ চরাভূমিকে বেষ্টন করে সমুদ্রে পতিত হয়। নদী মোহনাস্থিত ত্রিকোণাকার এ নতুন ভূমিকে ব-দ্বীপ বলে (চিত্র ৬.৪.৭)। যখন নদী কোনো সাগর, হ্রদে বা অন্য কোনো জলাশয়ে শেষ পর্যায়ে এসে মিলিত হয়, তখন নদী পরিবাহিত পলি ঐ অংশে মাত্রাহীন 'Δ'- এর (ল্যাটিন Δ ডেল্টা) আকারে সঞ্চিত হয়। ব-দ্বীপের আকার বিশেষভাবে নির্ভর করে নদীবাহিত পললের পরিমাণ, গঠন ও যেখানে পলি সঞ্চিত হয় সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর।

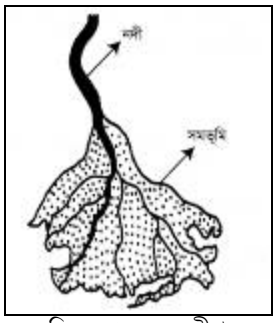

চিত্র ৬.৪.৭ : ব-দ্বীপ

নদীর প্রধান ধারা অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত (Distributaries)। এ সমস্ত শাখা নদীর মাধ্যমে প্রবাহ সমুদ্রে পৌঁছে। শাখা নদীসমূহ দ্রুত স্থান বদল করে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপসমূহের নাম ছকবদ্ধ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নদী সমুদ্রের নিকট এসে উপনীত হলে নদীর ঢাল ও গভীরতা একেবারে কমে যায়। নদীর উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয়। নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদী স্রোতের দ্বারা বাহিত হয়ে নদী গর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত হয়। নদীর এ অংশে পলি সঞ্চয়নই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নদী তার বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এই অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন সমভূমি, নদী বাঁক, প্রাকৃতিক বাঁধ, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী ও ব-দ্বীপ অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদী সমুদ্রে এসে পতিত হলে নদীর মোহনায় যে মাত্রাহীন 'ব' এর মত পলি সঞ্চিত স্থানকে কী বলে।

(ক) উপনদী (খ) ব-দ্বীপ (গ) প্লাবন সমভূমি (ঘ) অন্যান্য

২। নদীর বাঁক বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, একে কী বলে?

(ক) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (খ) গিরিখাত (গ) প্লাবন সমভূমি (ঘ) অন্যান্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের নদীসমূহে প্রচুর পরিমাণ চর দেখা যায়। কারণ নদীর ভাটি অঞ্চলে স্রোত কমে গিয়ে নদী প্রশস্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে গেলে এর বাস্তবরূপ দেখা যায়।

৩। নদীর সঞ্চয়কার্য কোথায় বেশি হয়?

(ক) উৎসে (খ) মরুভূমিতে (গ) মোহনায় (ঘ) পাহাড়ে

৪। নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ নয় কোনটি?

(ক) ব-দ্বীপ (খ) জলপ্রপাত (গ) নদী বাঁক (ঘ) প্লাবন সমভূমি

পাঠ-৬.৫ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা (River System in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীগুলোর নাম জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পারবেন।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। ফলে এদেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ওপর নদী ব্যবস্থার প্রভাব অধিক। নদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছে দেশের বহু শিল্প, কল-কারখানা ও কৃষিব্যবস্থা।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান প্রধান নদ-নদী সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

পদ্মা : হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভারতের উপর দিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্তদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর এর নাম হয়েছে পদ্মা। এর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২,৬০০ কি.মি.। পদ্মা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তদিয়ে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তপর্যন্তপ্রায় ১৪৪ কি.মি. ভারত ও বাংলাদেশের সীমা নির্দেশ করছে। তারপর এটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে রাজবাড়ি জেলায় গোয়ালন্দের কাছে যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পদ্মার শাখা নদীগুলো হলো- মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, কপোতাক্ষ, শিবসাত, পশুর, বড়াল, গড়াই, ইছামতি, নবগঙ্গা, কালীগঙ্গা, চিত্রা, তেঁতুলিয়া, বিষখালী, কীর্তনখোলা, কাউখালী, আগুন মুকা। পদ্মার উপনদী মহানন্দা, টাঙ্গন, নাগর, পুনর্ভবা, কুলিক।

ব্রহ্মপুত্র : ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে তিব্বতের 'সাংপো' এবং আসামের ডিহং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মাজহিয়ালী নামক স্থান দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর তিস্তা নদী এর সাথে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে এটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী যমুনা। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী হিসেবে পরিচিত যমুনা।

যমুনা : যমুনা নদী মূলত ব্রহ্মপুত্রের শাখা। তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোতধারাটি যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। যমুনা বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী। যমুনা নদীর পূর্ব নাম ছিল জোনাই নদী। যমুনার শাখানদী হলো- ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা এবং উপনদীগুলো হলো- তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, বাঙ্গালী, কালজানি, ডোরসা, যমুনেশ্বরী, দুধকুমারত, গঙ্গা, তুলসী গঙ্গা, বড়াল, নারদ ইত্যাদি।

মেঘনা : আসামের 'বরাক' নদী নাগা-মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণ থেকে উৎপত্তি লাভ করে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। শাখা দুইটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়েছে। মূলত সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত স্রোতধারাই মেঘনা নদী। সুরমা নামক শাখাটি প্রথমে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাতক ও সুনামগঞ্জের নিকট দিয়ে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে হবিগঞ্জ জেলার উত্তর সীমানায় পৌঁছে কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনা ভৈরববাজারের নিকট এসে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে যুক্ত হয়েছে। মেঘনা নদীর উপনদীগুলো হলো- শীতলক্ষ্যা, গোমতি, ডাকাতিয়া, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র।

কর্ণফুলী : কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পাহাড়ি এ নদী চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী। এটি বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী। উৎস থেকে কর্ণফুলীর মোহনা পতেঙ্গা পর্যন্তদৈর্ঘ্য ২৭২ কি.মি.। কাপ্তাই নামক

স্থানে কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ নদী কাপ্তাই হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বের হয় পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর উপনদীগুলো হলো- হালদা, চেঙ্গী, কাসালং, সাইনী, কাপ্তাই, রাখিয়াং, ইছামতি, শিলক, গোয়ালখালী ইত্যাদি।

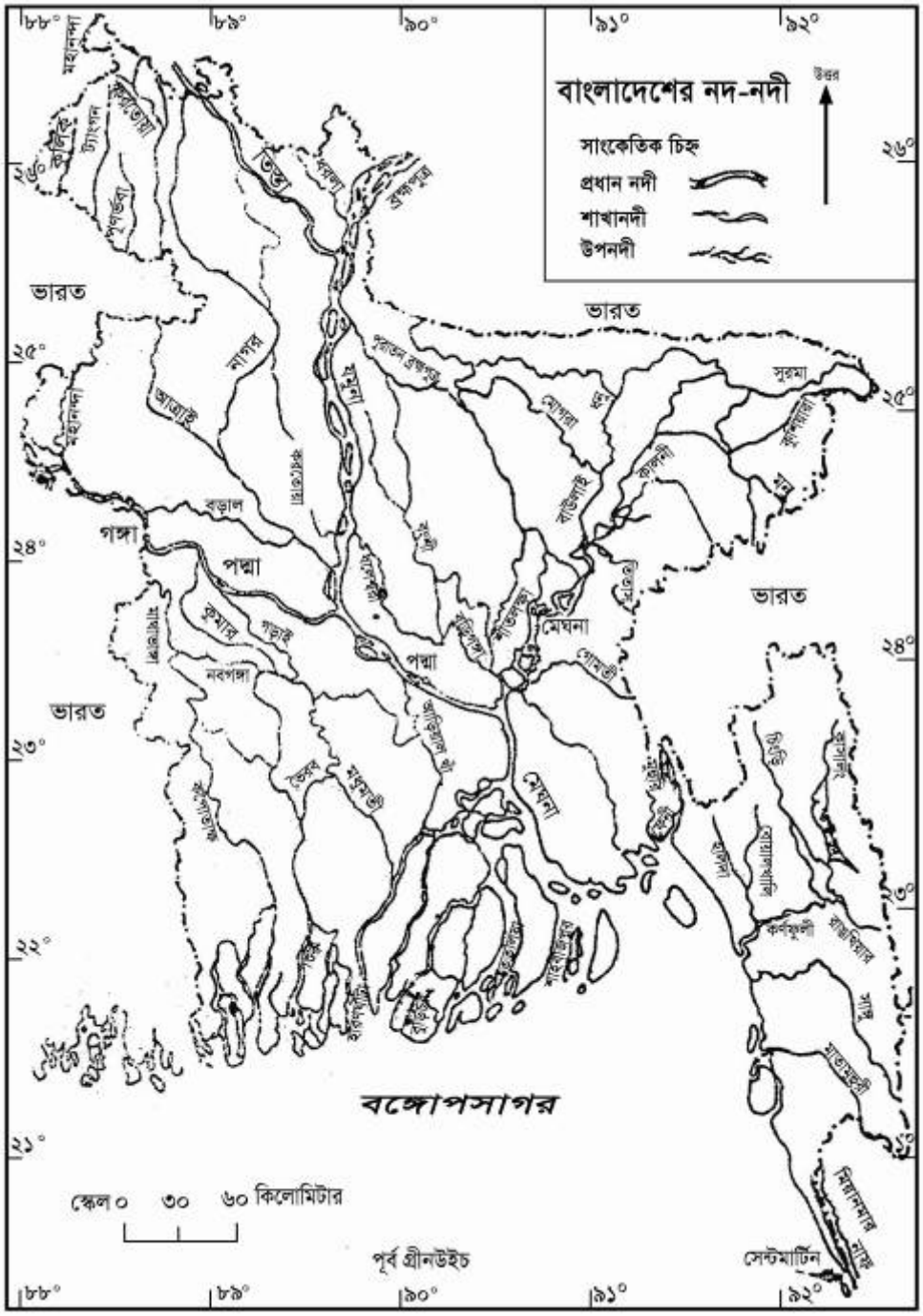

চিত্র ৬.৫.১: বাংলাদেশের নদ-নদী

করতোয়া : করতোয়া নদীর মূলধারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে। এটি পঞ্চগড় জেলার ভিটগড়ের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দিনাজপুর জেলার খানসামার নিকট এটি আত্রাই নামে পরিচিত। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে সমাধিঘাট পর্যন্তঅগ্রসর হয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করেছে। এ নদী পুনরায় রাজশাহী জেলার দেওয়ানপুরে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বড়াল নদীর মধ্য দিয়ে পাবনার বেড়ার নিকট যমুনায় পতিত হয়েছে। এটি যমুনার দীর্ঘতম উপনদী।

মহানন্দা : হিমালয়ের পাদদেশে দার্জিলিং এর নিকটবর্তী মহালড্রীম পর্বত হতে মহানন্দা নদী উৎপত্তি হয়েছে। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার উপজেলা সীমান্তএলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে। অত:পর ভারতের পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাপাইনবাবগঞ্জের নিকট বাংলাদেশে পুনরায় প্রবেশ করে গোদাগাড়ির কাছে পদ্মার মিলিত হয়েছে। নাগর, ট্যাংগন ও পুণর্ভবা এর উপনদী।

গোমতি : গোমতি নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের ত্রিপুরা পাহাড়ে। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে এ নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ নদী দাউদকান্দির কাছে এসে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

সাঙ্গু : সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড়ে। এ নদী চট্রগাম ও রাঙামাটি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ২৪৪ কিলোমিটার।

হালদা : হালদা নদীর উৎপত্তিস্থল খাগড়াছড়ি বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ। এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি লাভ করে বাংলাদেশের জলসীমায় সমাপ্তি ঘটেছে। হালদা নদী উৎপত্তি লাভ করার পর দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কালুঘাটের নিকট কর্ণফুলী নদীতে মিলিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো মানচিত্রে প্রদর্শন করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ার এখনকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ওপর নদীব্যবস্থা প্রভাব অধিক। এদেশের নদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছে দেশের বহুশিল্প, কল-কারখানা ও কৃষিব্যবস্থা। বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা, কর্ণফুলি, তিস্তা, মহানন্দা, করতোয়া, নাফ প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কর্ণফুলি নদী কোথায় অবস্থিত?

(ক) ঢাকা (খ) চট্টগাম (গ) রংপুর (ঘ) সিলেট

২। পদ্মা নদী ভারত ও বাংলাদেশের কত কি.মি. সীমানা নির্দেশ করেছে?

(ক) ১৪০ কি.মি. (খ) ১৩০ কি.মি. (গ) ১৪৪ কি.মি. (ঘ) ১৩৪ কি.মি

৩। ব্রহ্মপুত্র নদী কোন জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

(ক) চাপাইনবাবগঞ্জ (খ) সিলেট (গ) ফেনী (ঘ) কুড়িগ্রাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরার মত বাংলাদেশের নদীসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে সাগরের অভিমুখে ছুটে চলে। এই নদীগুলো পরস্পরকে বাঁচিয়ে রাখে।

৪। যমুনার শাখা নদী কোনটি ?

(ক) বুড়িগঙ্গা (খ) বাঙ্গালী (গ) তিস্তা (ঘ) করতোয়া

৫। পদ্মা যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?

(ক) মানিকগঞ্জে (খ) পাটুরিয়ায় (গ) গোয়ালন্দে (ঘ) আরিচায়

পাঠ-৬.৬ বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন ও এর প্রভাব
(River Erosion of Bangladesh and its Effects)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং
- বাংলাদেশে নদীভাঙ্গনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নদ-নদীগুলো সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। শাখা-প্রশাখাসহ নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি। দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ কি.মি.। নদীমাতৃক দেশ হওয়াতে এসব নদীতে ভাঙ্গন সমস্যা বহুদিনের। তাছাড়া এদেশের প্রায় নদীগুলোই সর্পিল বা বিনুনি ধরনের। নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী পাকা ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

নদীভাঙ্গন : যখন নদীর প্রবল স্রোতের আঘাতে তীরবর্তী অঞ্চলের জমি ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, তখন তাকে নদীভাঙ্গন বলে (চিত্র ৬.৬.১)।

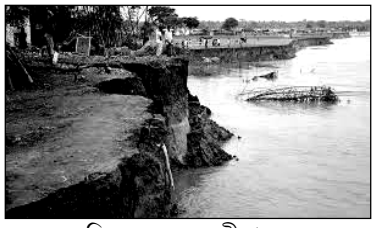

চিত্র ৬.৬.১ : নদীভাঙ্গন

নদীভাঙ্গনের প্রভাবক : নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বাংলাদেশের নদীভাঙ্গনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

- নদীখাত যখন পলি সঞ্চিত হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন নদীর খাড়া পাড় মাধ্যাকর্ষণজনিত কারণে এবং খাতের ক্ষেত্রে স্রোতের তোড়ে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়।
- বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে নদীর পানি বৃদ্ধি পায় এবং প্রবল স্রোতের সৃষ্টি করে। ফলে সামান্য আঘাতে নদী তীরে ব্যাপকভাবে ভাঙ্গন শুরু হয়।
- নদীর তীরে মৃত্তিকার বুনটে যদি বালুর পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে নদীভাঙ্গনের হার বেশি হয়।
- নদী উপত্যকা থেকে অপরিকল্পিতভাবে অতিমাত্রায় বালু, পাথর উত্তোলন করলে নদীভাঙ্গনের হার বেড়ে যায়।
- বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির পানি সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে প্রবল স্রোতের আকার ধারণ করে নদীতে পতিত হলে নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।
- নদী যখন আঁকাবাঁকা পথে চলে তখন নদী মোহনায় অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়। ফলে নদীর বাঁকের ভিতরের দিকে পলি জমতে থাকে এবং বাইরের দিকে নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া শুরু হয়।
- পাহাড়ি ঢলে নদী তীরের মৃত্তিকা আলগা হয়ে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়।
- নদীতে বড় বড় নৌকা, কার্গো, জাহাজ দ্রুত চলাচলের কারণে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় যা নদীর পাড় ভাঙ্গনে সহায়তা করে।

নদীভাঙ্গনের প্রভাব

১. **কৃষি জমি বিলীন :** নদী ভাঙ্গনের ফলে কৃষি জমি বিলীন হয়ে যায়। ফলে কৃষি পণ্য ও খাদ্যে ঘাটতি দেখা যায়।
২. **বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন :** নদীভাঙ্গনের ফলে নদী অববাহিকায় অবস্থিত বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে নদীতে বিলীন হয়ে যায়। ফলে অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।
৩. **নদীর চর বৃদ্ধি :** এক জায়গায় নদী ভেঙে অন্য জায়গায় পলি জমা হয়। ফলে নদীর নিচু স্তরে চরের সৃষ্টি হয়।
৪. **অবকাঠামো ধ্বংস :** নদীর পাড়ে অবস্থিত অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ নদীভাঙ্গনের সাথে ভেঙে পড়ে। ফলে অবকাঠামোগত দিক থেকে দেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় নদীভাঙ্গনের কারণ এবং প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নদী স্রোতের ফলে নদীর দুই তীরের মাটি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু যখন এই ক্ষয়ে যাওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে নদীভাঙ্গন বলা হয়। পাহাড়ি ঢল, প্রচুর বৃষ্টিপাত, বন্যা, নদীর বালু উত্তোলন প্রভৃতি কারণে নদীভাঙ্গন হয়ে থাকে। নদীভাঙ্গনের ফলে নদী তীরবর্তী বসতবাড়ি, কৃষি জমি, রাস্তাসহ অন্যান্য স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীভাঙ্গনের মনুষ্য সৃষ্ট কারণ কোনটি?

(ক) অধিক বৃষ্টিপাত (খ) পাহাড়ি ঢল

(গ) নদীর বালু উত্তোলন (ঘ) সবগুলো

২। নদীভাঙ্গনের ফলে কী হয়?

(ক) নদী বড় হয় (খ) নদীর স্রোত বৃদ্ধি পায়

(গ) কৃষি জমি কমে যায় (ঘ) সবগুলো

৩। নদীভাঙ্গন কোথায় বেশি?

(ক) পাহাড়ে (খ) সমতলে

(গ) মোহনায় (ঘ) কোনটিই নয়

৪। বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা কত?

(ক) প্রায় ৫০০ (খ) প্রায় ৬০০

(গ) প্রায় ৭০০ (ঘ) প্রায় ৮০০

পাঠ-৬.৭ নদীশাসন (River Training or Control)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীশাসন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- নদীশাসনের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

নদীশাসন

নদ-নদীর প্রভাব মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিবছর নানাবিধ কারণে নদীভাঙ্গন দেখা যায় যা অতি পরিচিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নদীর এ ভাঙ্গন প্রক্রিয়া প্রতিরোধ ও নদীর পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য বাঁধ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই হলো নদীশাসন। যেমন:- তিস্তা ব্যারেজ।

চিত্র ৬.৭.১ : নদীশাসন

বাংলাদেশের প্রায় সব নদ-নদীই সর্পিল। নদীভাঙ্গনের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল ভূমিকা পালন করে সর্পিল নদী। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কমবেশি নদীভাঙ্গন দেখা যায়। তবে নদীভাঙ্গনের ফলে সর্বোচ্চ ভূমিক্ষয় ঘটে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকায়। নদীভাঙ্গনের ফলে নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষের পালিত পশুসম্পদ, ফসলি জমি, জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য নদীভাঙ্গন রোধ করা একান্তপ্রয়োজন।

নদীশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ : নদীভাঙ্গন প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে একটি ভয়াবহ দুর্যোগ। নদীভাঙ্গনের ফলে মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে উঠা খুব কঠিন। নদীভাঙ্গন হাজার হাজার পরিবারকে করে গৃহহারা ও ভূমিহীন। নদীভাঙ্গনের ফলে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। তাই নদীশাসনের জন ইতোমধ্যে সরকার অনেক নদীর তীরে বাঁধ দিয়ে নদীভাঙ্গন রোধের চেষ্টা করছে। নদীশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

- উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করে এবং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদী খনন করে নদীশাসন করা ।
- নদীশাসনের জন্য নদীর পাড় থেকে অপরিকল্পিতভাবে মাটি কাটা ও পাথর তোলা বন্ধ করে নদীভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব।
- সমভূমি থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি একই পথে নদীতে পতিত হওয়া রোধ করে পরিকল্পিতভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলে নদীভাঙ্গন রোধ করে নদীশাসন করা যায়।
- প্রতিবছর নদীর পাড় ও বাঁধ সংস্করণ, নদী খনন, নদীর নাব্যতা ধরে রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে নদীভাঙ্গন রোধ করা যায়।

নদীশাসনের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ

১। বালুচর : নদীর গর্ভে বালি, নুড়ি, কাঁকর, কর্দম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে বালুচর বলে। বাংলাদেশের প্রায় সব নদীতে এ ধরনের বালুচর দেখা যায়।

২। পশ্চাৎ জলাভূমি : প্রাকৃতিক বাঁধের পিছনে নদীর পলি সঞ্চয় ধীরে ধীরে কমে যায়। ফলে এ ভূমি নিম্নভূমিরূপে অবস্থান করে। বর্ষার পর বন্যার পানি সরে গেলে নিম্নভূমিতে পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে অবস্থিত এরূপ জলাবদ্ধ ভূমিকে পশ্চাৎ জলাভূমি বলে। যেমন- ঢাকা জেলার ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিমে প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে এক বৃহৎ জলাভূমি রয়েছে।

৩। জলাভূমি বা বিল : নদীর গতিপথ পরিবর্তন করলে প্লাবন ভূমির মধ্যস্থ পরিত্যক্ত গতিপথ ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যায়। কিন্তু যেসব স্থান ভরাট হয়না সেখানে পানি জমে জলাভূমি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে প্লাবন ভূমির অভ্যন্তরে নিচু অঞ্চলে পানি জমে জলাভূমি সৃষ্টি হয়। এ ধরনের জলাভূমিকে বলা হয় বিল। যা নদীশাসনের ফলে সৃষ্টি হয়। রাজশাহীর চলনবিল, গোপালগঞ্জের বিল, সিলেটের বিল এর উদাহরণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	কীভাবে আমরা নদীশাসন করতে পারি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নদীশাসন বলতে বুঝায় নদীভাঙ্গন রোধে গৃহিত পদক্ষেপ যা নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও নদীর পানি ভিন্ন জায়গায় নিয়ে কৃষি বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য ব্যারেজ তৈরি করাকেও নদীশাসন বলা হয়। নদীশাসনের ফলে বালুচর, প্লাবন সমভূমি, পশ্চাৎ জলাভূমি প্রভৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীশাসনের উদাহরণ কোনটি?

(ক) তিস্তা ব্যারেজ (খ) তিস্তা ব্রিজ (গ) কামরাঙ্গীর চর (ঘ) সেচ প্রকল্প

২। বাংলাদেশে নদীভাঙ্গন কখন বেশি দেখা যায়?

(ক) গ্রীষ্মকালে (খ) শীতকালে (গ) বর্ষাকালে (ঘ) সারা বছর

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কীসের?

খ. নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলোর নাম লিখুন।

গ. নদীর ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়া কী কী? বর্ণনা করুন।

ঘ. জলপ্রপাত কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

'নদীর একুল ভাঙ্গিয়া গেলে, কী আর এমন যায় আসে, হাসিতে হাসিতে নদীর আরেক কুল যে জাগে' বাংলাদেশে একটি প্রচলিত গানটিতে নদীর বৈশিষ্ট্য ও কার্য প্রতীয়মান হচ্ছে।

ক. নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলো কী কী?

খ. নদীশাসন কী?

গ. বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাগুলোর নাম লিখুন।

ঘ. নদীভাঙ্গনের কারণ ও প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ :	১.ক	২.গ	৩.ক	৪.গ	৫.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ :	১.খ	২.খ	৩.ক	৪. ক	৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ :	১. গ	২.খ	৩.গ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ :	১.খ	২.ক	৩. গ	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ :	১.খ	২.গ	৩. ঘ	৪. ক	৫.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ :	১. গ	২.ঘ	৩.খ	৪. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ :	১.ক	২.গ			